বাংলার গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্ম শেখ মুজিবর রহমানের। বাবা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ সিভিল কোর্টে সেরেস্তাদারের কাজ করতেন। দুই কন্যাসন্তানের পর পুত্রের জন্মে মা সায়রা খাতুন নবজাতকের ডাকনাম রাখেন 'খোকা'। এরপর দম্পতির আরও দুই কন্যা ও এক পুত্রসন্তান হয়। ভাইবোনেদের কাছে মুজিব ছিলেন আদরের 'মিয়া ভাই'। ১৯২৯ সালে ক্লাস থ্রিতে মুজিব ভর্তি হন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে, দু'বছর পরে ক্লাস ফোরে মাদারিপুর ইসলামিয়া হাই স্কুলে। ছোট থেকেই নেতৃত্বদানের স্বভাব। অদক্ষ এক অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে ছাত্রদের নিয়ে বিক্ষোভে মুজিব নেতৃত্ব দেন বলে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন মুজিবের বাবা–মা। শৈশব থেকেই চোখের সমস্যা। ১৯৩৪ সালে চোখে অস্ত্রোপচার করাতে হয়। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরতে অনেক সময় লাগে। তাই স্কুলছুট চার বছরের জন্য। পরে ভর্তি হন গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে। সেখান থেকেই ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ। এরপর কলকাতায়

ইসলামিয়া কলেজ (এখন মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে ১৯৪৪ সালে আই এ এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বিএ পাশ করেন। এরপর আইন পড়তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। কিন্তু সে পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায় ১৯৪৯ সালের গোড়ায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায়। সে প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেন মুজিবকে। দীর্ঘ ৬১ বছর পরে ২০১০ সালে ওই বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেনে নেন, মুজিবের বিরুদ্ধে নেওয়া ওই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 'অন্যায্য এবং অগণতান্ত্রিক' ছিল। কৌতুকের বিষয়, এই ব্যবস্থা যখন নেওয়া হল তখন শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্র এবং শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কেউই ধরাধামে নেই।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে অভিনব একটি বিষয় পাঠকের নজরে আসবেই। বিষয়টি হল, তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটেছে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে। বাংলা পঞ্জিকা তথা ঋতুর হিসাবে যেটা বসন্তকাল। বসন্ত যে শুধু শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে লালের শোভা ছড়িয়ে দেয় না নয়, তা মহৎ কোনও উদ্দেশ্য সাধনে রক্তাক্ষরে শপথ নেওয়ার ক্ষণকেও চিহ্নিত করে। বাংলা ভাষা ও জাতিসত্তার মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিকে কি কোনও বাঙালি ভুলতে পারবে? এই সঙ্গেই স্মরণে রাখতে হবে পাক গণ পরিষদে অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে বাংলাকে গ্রহণ করতে বীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রতিক্রিয়াতেই ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা। ১৭ মার্চ শেখ মুজিবের জন্ম। তিনি বসন্তেরই সন্তান, যে বসন্ত শুধু ফুল ফোটানোর লগন নয়, কখনও কখনও সে দ্রোহকালও। কে ভুলতে পারে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার পর ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রেস কোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোকের সমাবেশ, মুজিবকে বিপুল সংবর্ধনা ও 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দান। আর বিশেষ করে উল্লেখ করতেই হবে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ওই একই ময়দানে শেখ মুজিবের সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতা। যে বক্তৃতার রেকর্ড আজও শুনলে যে কোনও বাঙালির গায়ে কাঁটা দেয়।

রেস কোর্স ময়দানে (এখন নাম হয়েছে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) সেদিন মুজিবের ভাষণ শোনার অপেক্ষায় লক্ষ লক্ষ লোক। সকলেই সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন কী বলেন সে মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদী নায়ক, বিপুল ভোটে জিতে আসা আওয়ামি লিগের নেতা শেখ মুজিব। ন্যায্য অধিকারে মুজিবেরই পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। কারণ ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামি লিগ জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টির মধ্যে ২৮৮টি পেয়ে (পরে আরও ১০টি মহিলা আসনের সংযুক্তি ঘটে) নিরঙ্কুশ জয়ীর ভূমিকায়। আওয়ামি লিগের এই বিপুল বিজয়ের পর দেশে কী হয় তা নিয়ে চলছে জল্পনা। অনেকেই আশা করলেন, এবারে মুজিবের দাবি মতো 'ছয় দফা'র ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হবে। কেউ ভাবলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন চক্রের সঙ্গে আপস করে মুজিব ক্ষমতায় আসবেন। এদিকে পাকিস্তান পিপ্‌লস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো ঘোষণা করেছেন তাঁর দলের সহযোগিতা ছাড়া কোনও সংবিধান রচনা বা কেন্দ্রীয় সরকার গড়া যাবে না। ভুট্টো বিরোধী আসনে ঠাঁই নিতেও নারাজ।

১৯৭১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন এবং মুজিবকে পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' আখ্যা দিয়ে চলে গেলেন। এরপরই কিন্তু তিনি লারকানায় ভুট্টোর সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসেন। জানুয়ারির শেষে ভুট্টো এলেন ঢাকায় মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে। বৈঠক শেষে ভুট্টো জানিয়ে দিলেন ছয় দফা মানতে তিনি নারাজ। মুজিবের যুক্তি, ছয় দফা এখন জনগণের সম্পত্তি। তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না। ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে না যেতেই ঘটল ভারতীয় বিমান ছিনতাই ও তা জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা। মুজিব এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেও ভুট্টো প্রকারান্তরে ছিনতাইকারীদের পক্ষ নেন।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ডাকলেন ঢাকায়, মার্চের ১ তারিখ। ভুট্টোর ঘোষণা, তিনি ওই অধিবেশনে যোগ দেবেন না, আরও জানালেন, দেশে ক্ষমতার দুর্গ তিনটি, পিপিপি, আওয়ামি লিগ এবং সেনাবাহিনী। যা কিছু করার এই তিনের সম্মতিতে করতে হবে। ইয়াহিয়াও জানালেন, সংবিধান রচনায় পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতাদের মতৈক্য দরকার। এরপরই প্রেসিডেন্ট ভেঙে দিলেন বেসরকারি মন্ত্রিসভা। নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আর কোনও বাঙালির অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকল না।

মুজিব বুঝছিলেন তাঁকে কিছুতেই ক্ষমতায় আসতে না দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তিনি জানিয়ে দিলেন 'ছয় দফা' অপরিবর্তনীয়। একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতার জোরালো দাবিরই আভাস দিল। এদিকে দেশে 'ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট' দেখা দিয়েছে এই যুক্তিতে ইয়াহিয়া ১ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করে দিলেন। এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ জনতা ঢাকার পথে নেমে এল। তাদের দাবি, মুজিব এবার কঠোর কর্মসূচি নিন। তিনি ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র প্রদেশে ধর্মঘট পালনের ডাক দিলেন। কার্যত পয়লা মার্চ থেকেই শুরু হয়ে গেল ধর্মঘট।

২ মার্চ ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামেও সফল ধর্মঘট পালিত হয়। ৩ তারিখ প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটে বিক্ষোভকারীরা পোড়াল পাকিস্তানি পতাকা। চট্টগ্রামে বাধল বাঙালি–বিহারি সংঘর্ষ। সেনাবাহিনী গুলি চালালে বহু লোক হাতহত হয়, যার মধ্যে বাঙালির সংখ্যাই বেশি। যুব এবং ছাত্রসমাজ চাইছে মুজিব একতরফাভাবে স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করুন। শিবনারায়ণ দাস নামে এক ছাত্র স্বাধীন দেশের পতাকার নকশা করে ফেললেন। ২ মার্চ সেই পতাকা তোলা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সারা পূর্ববঙ্গ জুড়ে তখন বসন্ত বাতাসে ভাসছে বিদ্রোহের গন্ধ। ৩ মার্চ শেখ মুজিব জানিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট আহুত গোল টেবিল বৈঠকে তাঁরা যাবেন না, সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিও করলেন তিনি। দেশ জুড়ে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে। তাতে যোগ দিয়েছেন অসামরিক আমলারা। এ অবস্থার মধ্যেই গভর্নর বদল। পূর্ব পাকিস্তানে নতুন গভর্নর হয়ে এলেন

জেনারেল টিক্কা খান। এখন সকলেই অধীর অপেক্ষায় ৭ মার্চ রেস কোর্স ময়দানের জনসমাবেশে কী ঘোষণা করেন মুজিব।

৭ মার্চ সকালে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড স্পষ্ট ভাষায় মুজিবকে জানিয়ে দিলেন, পূর্ব বাংলা একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তা সমর্থন করবে না আমেরিকা।

সাত তারিখ বিকেলে সভার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন মুজিব, সেই সময় স্ত্রী ফাজিলাতুন্নেছা তাঁকে বললেন, 'তোমার নিজের মনে যেটা আসবে সভায় সেটাই বলবে।' গাড়িতে ওঠার আগে চালকের প্রশ্ন, 'স্যার, আজ কী বলবেন?' মুজিবের উত্তর, 'মনে যা আসবে সেটাই বলব।' রেস কোর্স ময়দান সেদিন এক জনসমুদ্র। সেই জনসমুদ্রে আছড়ে পড়ল বসন্তের এক বজ্রকণ্ঠ — 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব। তবু এ দেশেরে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশা আল্লাহ! এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' বঙ্গবন্ধু মুজিব সেদিন ১৯ মিনিটের 'জীবন জাগানিয়া' কবিতার মতো আলোকময় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আজও সারা পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। 'ইউনেস্কো' ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর এই ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' রেজিস্টার–এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। আব্রাহাম লিঙ্কন, মার্টিন লুথার কিং–এর ঐতিহাসিক ভাষণের পাশাপাশি একই মর্যাদায় সংরক্ষিত মুজিবের এই ভাষণ — এটা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের বাঙালির কাছেই গর্বের বিষয়।

তাঁর শতবর্ষ পালনের ক্ষণে মনে হয় মুজিবকে নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নতুন করে চর্চার সময় এসেছে। এ কথা ঠিক মুখ্যত মুজিবের নেতৃত্বেই অজস্র প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করলেও শাসক হিসেবে সদ্য নতুন বাংলাদেশে আদর্শ শাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি মুজিব। নানা ক্ষেত্রেই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া ও স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর নামে। তাঁর সহযোদ্ধা ও দুঃসময়ের সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কেও ফাটল ধরেছিল। বিশেষ করে বাকশাল গঠন, জরুরি ক্ষমতা আইন ঘোষণা, জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার চালু করা, নিজে একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও বাকশাল–এর সভাপতির পদ অলংকৃত করা — এইসব পদক্ষেপ মুজিবের এতদিনের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তিতে কলঙ্ক আরোপ করল। দেশে কট্টরপন্থী মুসলমানদের চাপে মাদ্রাসার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (ও আই সি)–এ যোগদান এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার ব্যর্থতায় দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে ১৯৭৫ সালে ১৫ অগাস্ট ভোরে নিজ বাসভবনে ঘাতকের হাতে সপরিবার মৃত্যুবরণ। অনেকেই মনে করেন শুধু সিআইএ–র চক্রান্ত নয়, মুজিব নিজেই তাঁর অপঘাত মৃত্যুকে ডেকে এনেছিলেন।

মুজিব হত্যার পর কেটে গিয়েছে ৪৫ বছর। দোষ–ত্রুটি সত্ত্বেও কিন্তু মুজিবকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে। ভ্রান্তি থেকেই তো মানুষ শিক্ষা নেয়। ভবিষ্যতের ইতিহাস চর্চায় তাই অপরিহার্য হয়েই থেকে যাবেন বঙ্গবন্ধু।